কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

কৃষ্ণা রায়

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ কথারম্ভ ॥

"আমার মেয়ে এখন ডাক্তারি পড়ছে' একথা উচ্চারণ করতে এখনকার বাবা-মা অসম্ভব শ্লাঘা বোধ করেন। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে বাংলাদেশ কেন, সারা ভারতবর্ষেও ছবিটি এমন ছিল না। এমনকি গত শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত কোনো বাঙালি হিন্দু মেয়ে কলকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়ত না। এ বিষয়ে সেকালের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সমাজের সাধারণ মত ছিল, ভদ্রলোকের মেয়েরা কি ছেলেদের সঙ্গে মেডিকেল কলেজে পড়ে? অর্থাৎ ভদ্রজনোচিত নয় এমন মেয়েরাই ডাক্তারি পড়তে যায়। আর লেডি-ডাক্তারের সঙ্গে সাধারণ আয়া কিংবা ধাত্রীর পার্থক্য করতে পারতেন না গৃহস্থ মহিলারা। ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশেও ছবিটি ভিন্নতর কিছু ছিল না। অথচ বহু যুগ ধরে মেয়েরা চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছে, তার প্রমাণ আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কিংবা মৃতা মহিলাদের সমাধিতে। ভারতে দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থায় মেয়েরা যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রথায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

অনুসারী চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করেছে মেয়েরা অনেক পরে। আধুনিক বিশ্বের প্রথম মহিলা ডাক্তার এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিপ্লোমা পান ১৮৪৯ সালে, অনেক বাধা পেরিয়ে তিনি ডাক্তার হয়েছিলেন। ভারতীয় মহিলা চিকিৎসকদের মধ্যে পথিকৃৎ বলা যায় তিন নারীকে। এঁরা হলেন আনন্দিবাই যোশি, অ্যানি জগন্নাথন ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। একই সময় তাঁরা মেডিকেল পড়তে গিয়েছিলেন। তবে প্রথম দুজনই অকালে মারা যান। এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল ছিলেন আমেরিকার মেয়ে; ইউরোপে মেয়েরা ডাক্তারি পড়তে এলেন উনিশ শতকের ষাটের দশকে। এই প্রেক্ষাপটে, উনিশ শতকের আশির দশকে কোনো বাঙালি মেয়ের মেডিকেল কলেজে পড়তে চাওয়া নিশ্চিতভাবে একটি বিশেষ ঘটনা। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় সেই প্রথমা যিনি সমাজের বক্রদৃষ্টিকে অনায়াসে উপেক্ষা করে অসম্ভবের সাধনা করেছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত প্রথম বাঙালি নারী চিকিৎসক, কাদম্বিনী ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ে। ব্রাহ্ম সমাজের বহু শিক্ষাব্রতী, উদার-হৃদয় মানুষের সহযোগিতা তিনি পেয়েছিলেন; সর্বোপরি, তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ও প্রেরণার উৎসে ছিল তাঁর আকৈশোর-পরিচিত শিক্ষক, পরবর্তী পর্বে জীবন-সাথী ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে, সমসাময়িক বাঙালি মনীষা রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ড. নীলরতন সরকার ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-এর মতো তাঁরও জন্ম হয়েছিল ১৮৬১ সালে। এঁদের তুলনায় কোনো অংশে কম বর্ণময় নয় তাঁর জীবন। আর একথা তো অস্বীকার করা যায় না, কী সারস্বত সমাজে, কী পেশার জগতে নারীর পরিচিতি কিংবা প্রতিষ্ঠা অনেক বেশি সময়, শ্রম ও ধৈর্য দাবি করে। জীবনের

প্রতিটি অধ্যায়ে, পুরুষের সমান সুযোগ তাঁকে লড়াই করে আদায় করতে হয়েছে। মেডিকেল কলেজের ভারতীয় শিক্ষক থেকে শুরু করে সমকালীন বাঙালি জনমানসের উপেক্ষা, অপমানকে অগ্রাহ্য করে সর্বার্থে নিজেকে যোগ্য করে তুলেছেন—পেশার জগতে, গার্হস্থ্য জীবনে, রাজনৈতিক আন্দোলনে অথবা সমাজ-কল্যাণের কাজে। এককালে বিলেতে লেডি-ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে বলা হত, 'নাইদার অ্যা লেডি, নর্ অ্যা ডক্টর।' ভাবনাটা ছিল এমন যে এরা হল চরিত্রহীনা অথবা উন্মাদিনী। চরিত্রহীনা না হলেও কাদম্বিনীর জীবন কিন্তু এক অর্থে উন্মাদিনীরই জীবন। উন্মাদের মতোই জীবনভোর লড়াই করেছেন পেশার জগতে, গার্হস্থ্য-পরিমণ্ডলে। জীবনের অজস্র বৃত্তে প্রথমা হওয়ার বিরল সম্মান যাঁকে ছুঁয়ে গেছে, সেই নারীকেই পনেরো বছরের দাম্পত্যে হতে হয়েছে আট সন্তানের জননী, জননী হতে হয়েছে আরও দুটি সপত্নী-পুত্রের। পৃথিবীর সব দেশের প্রথম যুগের মহিলা-চিকিৎসকের মতো কৌমার্য-ব্রত অবলম্বন তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল না। পেশার জগতে নিজেকে অদ্বিতীয়া করে তোলার পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনের অজস্র দায়ভার পালন করতে গিয়ে নিজের কথা কিছুই লিখে যাওয়ার অবসর তাঁর হয়তো হয়নি। একটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যেমন সমসাময়িক কালকে সূচিত করে, তেমনি সব মানুষের জীবন কিন্তু 'জীবনী' হয়ে ওঠে না। কাদম্বিনীর জীবন সেই অর্থে 'জীবনের-পাঠ' গ্রহণের জন্য আদর্শ ছিল। বিখ্যাত সাহিত্যিক সিমোন দ্য ব্যভিয়ার পাঁচ খণ্ডে তাঁর আত্মজীবনী লিখেও বলেছিলেন, আমি মিথ্যা বলিনি, কিন্তু সব কিছু বলিনি। কাদম্বিনীর আত্মকথনের অভাব আমাদের পীড়িত করে, তাঁর আত্মজীবনী পাঠ করে উত্তরকালের নারী জাগরণ বা নারী-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষ হয়তো বা তাদের মনোবল

আরও বাড়িয়ে নিতে পারতেন—একথাও যেমন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, তেমনি মনে প্রশ্নও জাগে, আট সন্তানের জননী, চিকিৎসক কাদম্বিনীর একটিও সন্তান কেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত বৃত্তিতে আসেননি? এ বিষয়ে কাদম্বিনী একা নন, প্রথম যুগের বিবাহিতা মহিলা-চিকিৎসকদের অনেকেই এই বৃত্তিতে লগ্ন হওয়ার জন্য সন্তানদের উৎসাহিত করেননি।

উনিশ শতকের রক্ষণশীল বাঙালি সমাজ আজ অনেকাংশে মুছে গেছে, চিকিৎসকরা মহিলা হলেও আর সমাজে ব্রাত্য নন, বরং সম্ভ্রমের পাত্রী। তবু বিস্ময় লাগে, দেড়শো-বছর-বয়সিনী অসামান্য বাঙালি নারীটির জীবন সম্পর্কে মানুষের উৎসাহ বা কৌতূহল এত কম কেন?

এই বইটি লিখতে গিয়ে সহযোগিতা পেয়েছি অনেক মানুষের, তথ্য সূত্রের দৈন্যের কারণে জীবনীটির বহু-অংশই অনালোচিত থেকে গেল। তবু বিশেষভাবে সাহায্য নিয়েছি দুটি গ্রন্থের, কাদম্বিনী সম্পর্কে দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল শ্রী নারায়ণ দত্ত মহাশয়ের 'ঝড়ের মেয়ে কাদম্বিনী' এবং চিত্রা দেব-এর লেখা 'মহিলা ডাক্তার, ভিন গ্রহের বাসিন্দা।' আর একটি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানালে বড়ো অপরাধ হয়, তিনি সূত্রধর প্রকাশনার শ্রী সুমন ভৌমিক। কাদম্বিনী বিষয়ক আলোচনা-চক্রে আহ্বান করে সেই মহিয়সী নারী সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠতে আমাকে এবং আমার মতো আরও অনেককে বাধ্য করেছেন।

কৃষ্ণা রায়
প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
শারীরবিদ্যা বিভাগ
হুগলি মহসীন কলেজ

॥ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ॥

একুশ শতকের নারীর দৃপ্ত স্বচ্ছন্দ পদচারণায় এখন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভুবন ভরে গেছে। উনিশ শতকে চিত্রটি তেমন ছিল না। বহু লড়াই করে সেদিনের মেয়েরা চিকিৎসকের পেশায় স্থিত হয়েছিলেন। সেই লড়াইতে লগ্ন থেকে সংসারী ঘরণী হওয়ার সুযোগ অনেকেই পাননি। যারা পারেননি, সংসারের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে চেয়েছেন অথবা গোপনে চোখের জলে নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছেন। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নারী চিকিৎসক কাদম্বিনীর পায়ের তলার মাটি শক্ত করেছিলেন, বয়সে আঠারো বছরের বড়ো তাঁর বিপত্নীক, সমাজসেবী স্বামী। সেই সুযোগ-সাহচর্য হয়তো সেকালের অনেক নারী-ই পাননি। তবে পনেরো বছরের দাম্পত্যে আটটি সন্তানের পালন পোষণ, অসুস্থ সতীন-পুত্রের দায়িত্ব পালনে তাঁর ভূমিকা এবং চিকিৎসা পেশার মতো সময়-গ্রাসকারী পেশার দাবি মেটাতে তিনি সমান তৎপর ছিলেন। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে বৈধব্য পালন করা শুরু করেও তাঁর সমাজ সেবার আগ্রহ, রাজনৈতিক সচেতনতা

ও স্বদেশ সেবার স্পৃহা একটুও কমেনি। এমন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন নারীর জীবনী আজও প্রাসঙ্গিক। সমাজের বয়স বাড়লেও নারী বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি খুব কিছু বদলায়নি। আজও সংসারের সব দায়িত্ব পালন করেও নারীদের পেশার জগতে নিজের সেরাটুকু উজাড় করে দিতেই হয়। কাদম্বিনীর আট ছেলেমেয়ের একজনও চিকিৎসক হননি। তিনি কি তাদের সেভাবে প্রাণিত করতে পারেননি?

কাদম্বিনীর নামে তাঁর একদা অধ্যয়নের স্থান—বেথুন কলেজে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইমারত নির্মিত হয়েছে। সেই ইমারতে ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের নিত্য উৎসব ঘটে যায়। একশো চল্লিশ বছরের প্রাচীন সেই বেথুন কলেজের 'কাদম্বিনী-হলের সামনে দাঁড়িয়ে বার বার মনে পড়ে ভালো-স্ত্রী, ভালো-মা এবং ভালো চিকিৎসক হয়েও কাদম্বিনী কেন যে তাঁর জীবন-রেখার এক ফোঁটাও আঁচড় কেটে যাননি! ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েদের আত্মকথা লেখার প্রথা থাকলেও কেন যে তিনি তাঁর বিচিত্র সংঘাত-ময় জীবনের কথা লেখার অবসর খুঁজে নেননি!

না কি তিনি নিজেই চাননি তাঁর সংগ্রাম-দুঃখ ঘেরা দিনের কথা পাঁচজনকে জানিয়ে তাদের করুণাতপ্ত হৃদয়ের আলোড়ন খুঁজে নিতে।

হয়তো তিনিই ঠিক। কখনও কখনও আত্মসম্ভ্রমের অন্য নাম বোধহয় সচেতন আত্মগোপনীয়তা।

ড. কৃষ্ণা রায়
অধ্যক্ষ, বেথুন কলেজ

সূচিপত্র

প্রথম আলো : বাল্য ও কৈশোর	১৬
দুয়ার খোলার প্রহর : উচ্চশিক্ষা	২১
আরও আলো, আরও আলো : বাঙালি মেয়ের ডাক্তারি পড়া	৩০
উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে : প্রতিভার স্বীকৃতি	৩৮
হৃদয়-বান্ধব	৫২
নিভৃত-পদ্ম-কোরক	৫৭
শেষ কথা	৬৮
সহায়ক গ্রন্থ	৭২

॥ প্রথম আলো : বাল্য ও কৈশোর ॥

সে এক অদ্ভুত আঁধার ঘেরা সময়। বাঙালি ঘরের মেয়েরা তখন বিশ্বাস করত লেখাপড়া শিখলেই তারা বিধবা হবে। মুষ্টিমেয় কিছু মহিলা ছাড়া অধিকাংশের মুখে শিক্ষার আলো পড়েনি। সিপাহী বিদ্রোহ তখন সদ্য শেষ হয়েছে, বিদ্রোহের রুদ্র-তাপে ভারতীয় উপমহাদেশটি স্পষ্টতই আলোড়িত। ব্রিটিশ শাসকেরা প্রমাদ গণলেন। বুঝলেন দেশীয়-মানুষের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে তৈরি হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সময় ১৮৫৭ সাল। এই ঘটনার মাত্র চার বছর পর ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণযোগ্য সময় এল। ১৮৬১ সাল। এই বছরে ভারতে জন্মালেন বেশ কয়েকজন দিকপাল মানুষ। একজন কালোত্তীর্ণ কবি, এক অসাধারণ রসায়নবিদ, এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও সমাজ-কল্যাণে ব্রতী এক দার্শনিক-বিপ্লবী-সন্ন্যাসী। রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ড. নীলরতন সরকার, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখের পাশাপাশি

আরেকটি নাম স্মরণ করতেই হয়, সর্বার্থে এক অসাধারণ নারী, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়।

জীবন শুরু হয় অবশ্য কাদম্বিনী বসু নামে। জন্মেছিলেন ১৮৬১ সালের ১৮ জুলাই বিহারের ভাগলপুরে। তখন অবশ্য ভাগলপুর বৃহত্তর বাংলার অংশ। বাবা ব্রাহ্ম সমাজ-সংস্কারক ব্রজকিশোর বসু। মায়ের নাম জানা যায় না। ব্রজকিশোরের আদি বাড়ি ছিল ওপার বাংলা বরিশালের চাঁদশিতে। চাঁদশির জমিদার বংশের ছেলে ব্রজকিশোর আত্মীয়-পরিজনদের উপদ্রবে উত্যক্ত হয়ে ভাগলপুরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর দিদি তাঁকে খুব সাহায্য করলেন। সেখানে প্রথমে স্কুলে পড়ানোর চাকরি জুটল, পরে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ পেলেন। ব্রজকিশোর ছিলেন অত্যন্ত আধুনিক মনের মানুষ। ব্রাহ্মনেতা কেশব সেনের সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, ভাগলপুরে নারীমুক্তি আন্দোলনে তাঁর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। অভয়চরণ মল্লিক নামে এক ভদ্রলোকের সহযোগিতায় ভারতে প্রথম মহিলা সমিতি তিনি গড়ে তুলেছিলেন ভাগলপুরে। কাদম্বিনীর জন্মের দু বছর পরের ঘটনা সেটি। শ্রাবণ মাসের জাতিকা কাদম্বিনী ছিল সুন্দরী, উজ্জ্বল তাঁর গায়ের রং। দুই দাদার পর তাঁর জন্ম। এর পরে তাঁর আরও একটি ভাই ও বোন জন্মায়।

উনিশ শতকের মধ্য পর্বের পর থেকেই ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যরা নারী-শিক্ষা বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। সাধারণ হিন্দু ঘরের মেয়েদের অবস্থা ছিল নিতান্তই করুণ। এ সম্পর্কে রাসসুন্দরী দাসী তাঁর লেখা 'আমার জীবন' গ্রন্থে (১২৮৩ বঙ্গাব্দ/১৮৭৬ সাল) বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, 'তখন মেয়েরা

লেখাপড়া শিখত না, সংসারে খাওয়াদাওয়ার কর্ম সারিয়া যে কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিত, তখন কর্তা ব্যক্তি যিনি থাকিতেন, তাহার নিকট অতিশয় নম্রভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত। যেন মেয়েছেলের গৃহকর্ম বৈ আর কোনো কর্মই নাই। তখনকার লোকের মনের ভাব এইরূপ ছিল।' কাদম্বিনীর ক্ষেত্রে অবশ্য এমনটি ঘটার সম্ভাবনা ছিল না, যেহেতু তার বাবা নারী শিক্ষার অত্যুৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। সে সময় অরবিন্দ ঘোষের বাবা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ভাগলপুরে আসেন। সময়টা ১৮৬৬ সাল। সেখানে তিনি ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি স্কুল খুললেন। সেই স্কুলে শিশু কাদম্বিনীর পাঠপর্ব শুরু হল। স্বাধীন-মুক্ত বাতাবরণে শৈশব কাটছিল তার। ইতিমধ্যেই ব্রজকিশোর ও তাঁর ব্রাহ্মসঙ্গীরা লক্ষ্য করেছেন কাদম্বিনী অত্যন্ত মেধাবী। অতএব তাঁর পড়াশুনোর জন্য আরেকটু বেশি যত্ন নেওয়া দরকার।

চোদ্দো বছর পূর্ণ হওয়ার পর ১৮৭৬ সালে কাদম্বিনী কলকাতায় পড়তে এল। এতবড়ো শহরে ভাগলপুরের কিশোরী মেয়েটি থাকবে কোথায়? ব্যবস্থা করতে এগিয়ে এলেন তাঁর পিসতুতো দাদা ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ। বিলেতফেরত এই দাদাটি কাদম্বিনীর সেই পিসির ছেলে, যিনি ব্রজকিশোরের ভাগলপুরে বসবাসের বন্দোবস্ত করে দেন। মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল উদারচিত্ত কৃতবিদ্য ইংরেজ মহিলা অ্যানেটা সুসান অ্যাক্রয়েড-এর। কলকাতার বেনিয়াপুকুর লেনের ভাড়াবাড়িতে মিস অ্যাক্রয়েড একটি স্কুল তৈরি করেন ১৮৭৩ সালে। স্কুলের নাম হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়। এই আবাসিক স্কুলে পাশ্চাত্য প্রথায় পড়াশুনো হত। কালক্রমে মিস অ্যাক্রয়েড-এর

বিয়ে হয়ে গেল এবং স্কুলটির অবস্থা বেসামাল হয়ে পড়ল ১৮৭৬ সাল থেকেই। এই দুঃসময়ে কিছু নারী কল্যাণকামী, উদারচেতা বাঙালি যুবকের উৎসাহে স্কুলটি নতুন করে তৈরি হল। এবারের ঠিকানা কলকাতার ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, সময় ১ জুন, ১৯৭৬। স্কুলের নামকরণ হল বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয়। এই স্কুলে পড়তে এল কাদম্বিনী। সে সময় কলকাতায় বেথুন স্কুল যথেষ্ট পরিচিত। তবু বিলেত ফেরত দাদা ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ চাইলেন তাঁর মেধাবী বোনটি শৃঙ্খলা ও দায়িত্বের মধ্য দিয়ে পড়াশুনো শিখুক এই আবাসিক স্কুলে। এই স্কুল গঠনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন ব্রাহ্ম নেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের মতো এরা বিশ্বাস করতেন না নারী-পুরুষের শিক্ষায় ফারাক থাকা উচিত, শুধুমাত্র গৃহস্থালির কাজ পরিচালনার জন্য শিক্ষিত হবার প্রয়োজন মেয়েদের নেই।

এই স্কুলে কাদম্বিনীর সহপাঠিনী ছিল হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট দুর্গামোহন দাস-এর মেয়ে সরলা, ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের বোন বিনোদমণি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বোন স্বর্ণপ্রভা। এই স্কুলের দারোয়ান, ঝাড়ুদার, ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিষয়ে নজরদার ও শিক্ষক সবই ছিলেন এক অসাধারণ মানুষ; ব্রাহ্ম সমাজ-সংস্কারক ও নারী মুক্তি আন্দোলনের নেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পূর্ববঙ্গ থেকে ১৮৭০ সালে কলকাতায় এসে তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবল আলোড়ন ফেলেছিলেন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনাসভায় মেয়েরা কেন পর্দার

পেছনে বসবে? পরবর্তীকালে গোঁড়া আদি ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হলে তিনি হলেন সম্পাদক।

ভাগলপুরের কিশোরী কন্যাটি কলকাতা শহরে এসে বোর্ডিং স্কুলে বন্দি হল। এই বন্দিত্ব আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করার তাগিদে। চোখে তাব এখন নতুন আলো এসে পড়েছে।